মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারানের নাতজামাই:

বাংলা সাহিত্যের প্রগতিশীল ও গণমুখী ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। চল্লিশের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তিনি সাধারণ খেটে-খাওয়া, শোষিত মানুষের জীবনযাত্রাকে অতি সূক্ষ্ম ও বাস্তবসম্মতভাবে তাঁর সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সময়কালের এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা হলো তেভাগা আন্দোলন। অবিভক্ত বাংলার বর্গাচাষী বা ভাগচাষীদের নিজেদের উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ আদায়ের এই লড়াই ছিল শোষক জোতদার-জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম।এই আন্দোলনের রক্তঝরা ও গৌরবময় প্রেক্ষাপটেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন তাঁর কালজয়ী গল্প 'হারানের নাতজামাই'।

১৯৪৬ সালের শেষের দিকে শুরু হওয়া তেভাগা আন্দোলন ছিল মূলত বাংলার প্রান্তিক কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের বাঁচার লড়াই।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে এই গণ-আন্দোলনের ভেতরের শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই আন্দোলন কেবল ভাতের লড়াই নয়, এটি মানুষের আত্মমর্যাদা ও শ্রেণীচেতনা জাগরণের লড়াই। এই ধারণারই সার্থক শৈল্পিক রূপ রূপায়িত হয়েছে 'হারানের নাতজামাই' গল্পে।গল্পের পটভূমি রাধানগর গ্রাম—যা তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। জোতদার ও পুলিশের অত্যাচারে গ্রামের পুরুষরা প্রায় সবাই পলাতক। গ্রামের বুড়ো হারান শিকদার এক জীর্ণ ও বিপর্যস্ত পরিবারের প্রধান। তার পরিবারে রয়েছে তার বিধবা মেয়ে, নাতনি ময়না এবং ময়নার স্বামী ভুবন। ভুবন মূলত পাশের গ্রামের ছেলে, কিন্তু সে তেভাগা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ও সংগঠক। পুলিশের খাতায় সে একজন 'ফেরার' আসামী। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। সে রাধানগর গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু এই আশ্রয় কেবল জামাই আদরের জন্য নয়, বরং বিপন্ন অবস্থায় আত্মগোপন ও আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখার এক মরিয়া চেষ্টা। এই ভুবনকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে গল্পের মূল দ্বন্দ্ব, যেখানে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-সম্পর্কের চেয়ে শ্রেণী-সম্পর্ক এবং যৌথ লড়াইয়ের চেতনা বড় হয়ে উঠেছে।

'হারানের নাতজামাই' গল্পটি শুধু তেভাগা আন্দোলনের একটি বিবরণী নয়, এটি আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সার্থকতাকে তুলে ধরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথাগত রোমান্টিকতা বর্জন করে চরম বাস্তবতায় গল্পটিকে সাজিয়েছেন। যেখানে ভুবন চরিত্রটি তেভাগা আন্দোলনের সেইসব লড়াকু যুবকদের প্রতীক, যারা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে কৃষকদের সংগঠিত করেছিল। সে শ্বশুরবাড়িতে এসে 'জামাই' হিসেবে কোনো বাড়তি খাতির আশা করে না, বরং সে জানে যে তার উপস্থিতি ওই পরিবারটিকে চরম বিপদের মুখে ফেলতে পারে। আবার গল্পে ময়না এবং তার মা প্রথাগত গ্রামীণ অবলা নারী নয়। তারা জানে ভুবনকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থ কী। পুলিশ যখন বাড়িতে চড়াও হয়, তখন ময়না ও তার মা যেভাবে ভুবনকে রক্ষা করার জন্য বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের পরিচয় দেয়, তা তেভাগা আন্দোলনের বাস্তব ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গল্পকার দেখিয়েছেন, শোষণের তীব্রতা কীভাবে ঘরের কোণের নারীদেরও বীরাঙ্গনায় পরিণত করে।

বাঙালি সমাজে 'জামাই' বা 'নাতজামাই' অত্যন্ত খাতিরের এবং আদরের পাত্র। কিন্তু আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে এই প্রথাগত পারিবারিক সম্পর্কের রূপ বদলে যায়। হারানের বাড়িতে ভুবন যখন আসে, তখন তাকে লুকানো এবং বাঁচানোটা কোনো পারিবারিক কর্তব্য থাকে না, তা হয়ে ওঠে আন্দোলনের অংশ।যখন পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করে, তখন বুড়ো হারান নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে ভুবনকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থকতা—তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন মানুষের ভেতরের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা দূর করে এক বৃহত্তর 'যৌথ চেতনা' তৈরি করে।

গল্পের শেষ দৃশ্যটি এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। পুলিশ যখন হারানের বাড়ি তল্লাশি করতে আসে, তখন গ্রামের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নারীরা যেভাবে সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তা তেভাগা আন্দোলনের মূল চরিত্রকে তুলে ধরে।ভুবন ধরা পড়ল কি পড়ল না, তার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে গ্রামীণ জনতার এই জেগে ওঠা। হারান শিকদার, যে বয়সের ভারে এবং শোষণে ন্যুব্জ ছিল, সেও শেষ পর্যন্ত লাঠি হাতে রুখে দাঁড়ায়। এই রূপান্তরই হলো তেভাগা আন্দোলনের আসল সার্থকতা, যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর তুলির শেষ টানে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের শুরুতে হারানের পরিবারের মধ্যে একটা চাপা ভয় ও আতঙ্ক ছিল। জোতদারের অত্যাচার এবং পুলিশের বুটের শব্দে তারা অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ভুবনের আগমনের পর সেই ভয় ধীরে ধীরে প্রতিরোধে রূপান্তরিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' কেবল তেভাগা আন্দোলনের একটি সাহিত্যিক দলিল মাত্র নয়, এটি হলো শোষিত মানুষের অপরাজিত চেতনার এক কালজয়ী ইশতেহার। লেখক দেখিয়েছেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলন যখন সাধারণ মানুষের ঘরে পৌঁছায়, তখন তা কেবল তাত্ত্বিক স্তরে থাকে না; তা মানুষের প্রতিদিনের সম্পর্ক, ভাষা ও মনস্তত্ত্বকে বদলে দেয়।অভাব, পুলিশি নির্যাতন আর জোতদারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে রাধানগর গ্রামের মানুষ যেভাবে ভুবনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তা প্রমাণ করে যে শোষিতের ঐক্যই শেষ পর্যন্ত শোষকের সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ। তেভাগা আন্দোলনের এই মূল সুরটিকে অত্যন্ত সততা ও শৈল্পিক দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলতে পারার মধ্যেই 'হারানের নাতজামাই' গল্পটির সামগ্রিক ও কালোত্তীর্ণ সার্থকতা নিহিত।